বামপন্থিদের মিলিত শক্তিতে জনগণের সংগ্রামী ঐক্য জোরদার করে রাজনীতির অন্ধকার অচলায়তন ভাঙতে হবে

৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচনের ইতিহাসে এই নির্বাচন এক নব সংযোজন ঘটিয়েছে। বিদেশি সংবাদ মাধ্যম বিবিসি ভোট শুরুর আগ মুহূর্তে আধা ভর্তি ভোটের বাক্সের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলো। ভোটের অনেক আগে থেকেই অব্যাহতভাবে চলে আসা ত্রাস-সন্ত্রাস, হামলা-মামলা, হয়রানি, গ্রেফতার ও আতঙ্কসহ এক ভীতিকর পরিবেশ এমনভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছিল যার সুফল হিসাবে ভোটের দিনে এক শান্তির পরিবেশ (!) রচনা করা গেছে। সিগনালে থেমে থাকা ট্রেনের মতো নিশ্চল সারিবদ্ধ ভোটারের লাইন যেমন দেখা গেছে; তেমনি আচমকা গোলযোগে পুলিশি তৎপরতায় ফাঁকা মাঠের দৃশ্যও নজরে এসেছে। ভেতরে ভোটার উপস্থিতি তেমন না থাকলেও ভোটের পরিমাণ ও জয়ী-পরাজিতের ভোট ব্যবধান কোন হিসাবে মেলানো সম্ভব ছিল না। এক কেন্দ্রের বিতর্কিত ইভিএম ভোটের হার আর অন্য কেন্দ্রে সিল মারা ভোটের হার মেলানোও ছিল কঠিন। সচরাচর অনেক অনিয়মের বাইরেও যেটি অভিনব হয়ে দেখা দিয়েছে তা হলো ভোটের অর্ধেক কাজ আগের রাতেই সম্পন্ন করা হয়েছিল বলে জনমনে এ ধারণা স্থায়ীভাবে বসে গেছে। শাসক জোটভুক্ত শরিক দলের মধ্য থেকেই একটি দল খোলামেলা জনসমক্ষে বিষয়টি বলেছেন; তবে তারা আগের রাতে ভোটের বাক্স ভর্তি করার দায়টি প্রশাসনের কাঁধে চাপাতে চেয়েছেন। এটা বিষয়ের সত্যতাকে নিশ্চত হতে সাহায্য করেছে। এটা একটা জিজ্ঞাসাকে উঠিয়ে এনেছে যে কীভাবে এবং কোন প্রয়োজনে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটি সকল প্রশাসনসহ এভাবে শাসক দলের সঙ্গে দেহে-মনে এক হতে পেরেছিলো একটি অন্যায্য কাজ সম্পাদনে! এটাকে ধনিক শ্রেণির গড় শ্রেণি স্বার্থের প্রয়োজনে সাজানো পরিকল্পনা ছক বলা যায়। যদিও বাস্তবায়ন কাজে অতিমাত্রা যোগে পরিমিতি ঘাটতি স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদনকে নীরব প্রত্যাখ্যানের জায়গায় নিয়ে গেছে। তারপরও শাসক দল মান-অভিমান, রাগ-গোস্বা করা জোট-মহাজোট নিয়ে নিরুপদ্রব-নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে পারছে এবং শাক দিয়ে মাছ ঢাকার নানা আয়োজনে ও চমক সৃষ্টিতে যেভাবে সময় পাড়ি দিতে যাচ্ছে তা কীকরে সম্ভব হলো। তা নিয়েও নানা জিজ্ঞাসা ও ভাবের উদয় ঘটেছে।

এ ক্ষেত্রে কতগুলি বিষয় লক্ষণীয়। সারা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া জুড়েই বুর্জোয়া গণতন্ত্র এক মহাসংকটে পড়েছে। রুশ বিপ্লবের নেতা কমরেড লেনিন অনেক আগেই বলেছিলেন, জনগণের অধিকার চর্চার অর্থে বুর্জোয়া গণতন্ত্র এযুগে শোষক শ্রেণির কোন অংশ কয়েক বছর পর পর নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের অনুমোদন নিয়ে শাসন-শোষণ চালাবে তার নামই হয়েছে গণতন্ত্র। অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশের বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের স্বার্থের ও পক্ষের মতামত উৎপাদন করার ক্ষমতা ও প্রচার মাধ্যমে সূক্ষ্ম কলাকৌশলে জনগণের মনে-মগজে প্রবেশ করানোর দক্ষতা এমনভাবে রপ্ত করেছে যে জনগণকে দিয়েই জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়। দ্বিদলীয় বা বহুদলীয় অভিনয়কলা, আসর উত্তেজনা ও বিনোদন উৎসব এর সহায়ক হয়। বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণি সে সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। তাই ২৯ ডিসেম্বর রাতের ঘুমন্ত মানুষের অনুমোদন ৩০ ডিসেম্বর জাগ্রত মানুষের কাছে হাজির করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুমোদন লাভের এটা একটা বিরল সংযোজন। বহুদলীয় পার্লামেন্টারি আসর জমানোব্যবস্থা তো স্বাধীনতা উত্তর স্বল্প সময়েই হারিয়ে গেছে। তার বদলে এক দলের প্রতিস্থাপন ব্যবস্থাও টেকেনি। সামরিক ও অসামরিক শিকলে ঘিরে জনগণকে শৃঙ্খলায় ফেরানোর চেষ্টা শেষে দ্বিদলীয় রশি টানাটানির পর্বও শেষ হয়েছে। এখন এক বাড়িতে থাকা, এক হাঁড়িতে খাওয়া ও এক গাড়িতে উন্নয়নের মহাসড়ক পাড়ি দেয়ার পালা। দুর্নীতি বিরোধী হর্ন-সাইরেন বাজানো হচ্ছে জোরেশোরে। আর দুর্নীতি শিকারি দুদক হাঁকডাক দিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। তবে আদালত বলছে ওরা শুধু চুনোপুঁটি ধরছে রাঘববোয়াল এড়িয়ে চলছে। তাছাড়া তারা নিজেরাও দুর্নীতির পাঁক গায়ে মেখেছে কীনা সে সন্দেহও দেখা দিয়েছে। তাদের ভুলে হোক্ কিংবা নয়ছয় কারবারে হোক্ জাহালম নামের এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে ৩ বছর জেল খাটতে হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী শত কোটি টাকা আত্মসাৎ দুর্নীতি, বিদ্যুৎ বিভাগের দুই সিবিএ নেতার দখলে ১০ বছর ধরে পাজেরো গাড়িসহ বিত্ত অর্জনের দুর্নীতি ইত্যাদি ধরা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে নিম্নসারির একজন কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে একশত কোটি দূরে থাক এক কোটি টাকা হাতিয়ে নিতে হলে উপরের স্তরের প্রভু মহাপ্রভুদের শত কোটি টাকা যোগান দিয়েই যে তা করতে হয়, একথা না জানার, না বুঝার তো কারণ নেই। কিন্তু উপর তলার মহারথীরা কোথায়? আগে মাছের মাথা পঁচে। তারপরে শরীরে পচন নামে। ফলে দুর্নীতির মূল ওপরে। মূল বৃক্ষ কাণ্ড অক্ষত রেখে ডালপালা ছাঁটলে সেগুলি আবার গজাবে, আবার ছাঁটা হবে। লাভ কী? তবে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চালাতে গিয়ে যাতে পুঁজিবাদী লুণ্ঠন দস্যুতার মূল কাঠামোতে আঘাত না লাগে সে সতর্কতা তো তাদের থাকতেই হয়।

একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, পুঁজিবাদী বিশ্ব সংকটকালে বাংলাদেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে তেজি ঘোড়ার মতো দৌড়িয়ে চালাতে সক্ষম শেখ হাসিনার নেতৃত্ব, আওয়ামী লীগ দল ও জোট-মহাজোট—এর বিকল্প নেই। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি অগোছালো, এলোমেলো, বিধ্বস্থ দশায় পতিত। প্রধান ও দ্বিতীয় নেতা মাতা-পুত্র দুজনেই সাজার বোঝা মাথায় নিয়ে একজন কারাগারে অন্যজন বিদেশে। বাকি নেতা-কর্মীরা হামলা-মামলায় পর্যুদস্ত। জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ, শত্রুমিত্র নির্ধারণ, সখ্য নির্বাচন,

কলা কৌশলগত পারদর্শিতা প্রদর্শন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এরা পিছিয়ে পড়েছে। পরিস্থিতির বদল পরিমাপেও এরা অনগ্রসর। উদারপন্থীদের সাথে হাত মিলিয়ে জাতে ওঠার ও কূল পাবার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সেটাও চরম দক্ষিণপন্থী শক্তিকে টানতে গিয়ে হাত ছাড়া করেছে। জনপ্রিয়তা ও সহানুভূতি এদের পক্ষে যতোটা ভারী ততোটা এককেন্দ্রিক কঠিন শৃঙ্খলায় সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি মোকাবেলার সামার্থ্যও এদের তেমন নেই। এ দলে যোগ্য নেতা নেতৃত্বের ঘাটতি নেই, অভিজ্ঞ উপদেষ্টা মণ্ডলিরও ঘাটতি নেই। তবে এদের চিন্তাদর্শের একমুখীনতা ও কাজের সমন্বয় নেই। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনা কেন্দ্রিক দলীয় রেজিমেন্টেশন এমন জায়গায় তুলতে সক্ষম হয়েছে যেখানে আন্তঃদলীয় কোন্দল, তাপ-উত্তাপ সীমানাবৃত্ত ভেদ করে বেরিয়ে পড়ার কোন ফাঁক পাচ্ছে না। তাছাড়া উন্নয়নের উন্নতির ছোঁয়া সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের চেহারা বদলে দিয়েছে। অব্যাহত চাপের মুখে প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তির দুর্বলতা-অক্ষমতা থেকে এরা বুঝে নিয়েছে যে তাদের ভোগ দখল ক্ষণস্থায়ী হবার নয়। ক্ষমতার সাথে ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সকল অংশও নিজ নিজ অবস্থান থেকে একই বুঝ বুঝে নিয়েছে। নিম্ন আদালত নির্বাহী কর্তৃত্বের অধীন এমনিতেই রয়েছে আর প্রধান বিচারপতিকে যেভাবে বিতাড়িত করা হয়েছে তাতে উচ্চতর আদালতসহ গোটা বিচার ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমলাতন্ত্র, 'পাবলিক সার্ভেন্টস' এর জায়গায় সরকার বা সরকারি দলের 'গর্ভমেন্ট সার্ভেন্ট' হয়ে পায়ের উন্নতি (পদোন্নতি), হাতের উন্নতি বংশগতির উন্নতি ইত্যাদির তালাশে ও প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট। অসন্তুষ্টেরাও মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখেন। প্রতিপক্ষ দমনের ও ভীতিকর পরিবেশ রচনার প্রধান শক্তি পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী। এই কাজে নির্দেশের বাইরেও অত্যুৎসাহ প্রদর্শনে একদিকে শাসকদলের কাছ থেকে প্রশংসা স্বার্থ সুবিধা লাভ তো হয়ই উপরন্তু বাড়তি আয় উপার্জনের রাস্তাও বাধামুক্ত হয়ে যায়। তিন দিকে ঘিরে থাকা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের গিলে খাওয়া ক্ষমতা সম্পর্কে এমন এক ধারণা তৈরি হয়েছে যে সেটাও একটা কারণ অকারণ নেতিবাচক উপাদান তৈরি করে। স্বাধীনতাত্তোর দীর্ঘকাল যারা আদি পুঁজি সঞ্চয়ের লুটতরাজ চালিয়ে, ব্যাংক, পুঁজিবাজার লুট করে, শ্রম শোষণ করে, দখল-দস্যুতা চালিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক বনেছেন, তারা এখন একটা শান্তিপূর্ণ দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশ চায়। নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা চায়, যাতে দেশি বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ ও লুণ্ঠনের ব্যাপক ক্ষেত্র তৈরি হয়। তাতে উন্নয়ন আরও চকচকে চেহারা নেবে। বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে কর্মসংস্থান ও নানামুখী কর্মকাণ্ডের প্রসারও দেখানো যাবে। ভোট ডাকাতি করে যেমন গণতন্ত্রী হওয়া যায়, তেমনি লুটপাট করেও সফল উদ্যোক্তা বনা যায়। আগে বেসামরিক বুর্জোয়া শক্তি শাসন সংকট দূর করতে কিংবা শাসন পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে সামরিক বাহিনীর ডাক পড়তো। ৪৭ বছরে দুইবার সরাসরি ও একবার পরোক্ষভাবে তারা এসে মিমাংসার চেষ্টা ও স্থিতাবস্থা তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু এবার সামরিক বাহিনীর নির্বাচনকালে গা ছাড়া ভাব দেখে অনেকে সে আশাও ছেড়েছেন।

ক্ষমতাসীনদের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপি ও তাদের জোট আপাতত ব্যর্থ। ধর্মবাদী শক্তিগুলিও পক্ষপুষ্ট বাদ দিয়ে নিজ পায়ে দাঁড়াতে অসমর্থ্য, উদারপন্থীরাও দ্বিধান্বিত। ফলে বামপন্থার বিরুদ্ধে শতমুখে নিন্দা, উপহাস-পরিহাস সত্ত্বেও এখন তারাই দুর্বল শক্তি নিয়েও মাঠের আন্দোলনে অনেক বেশি দৃশ্যমান। বামপন্থীদের মিলিত শক্তি তার সাথে জনসম্পৃক্তি ঘটাতে পারলেই কেবল ধীরে ধীরে অচলাবস্থা অবসানের সূচনা করা যাবে। শাসকদের দুর্বৃত্তায়ন ও দুঃশাসনকেও চাপে ফেলা যাবে। জনগণের উত্থানের শক্তি যতো জাগানো যাবে ততই অন্ধকার ভেদ করে মুক্তি চেতনা উদ্ভাসিত হবে। অপরাপর শক্তিসমূহও এগিয়ে আসবেন। জড়তা বন্ধ্যত্ব কাটবে। রাজনীতি গতি ফিরে পাবে।